৬

স্বাধিকার আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ

ভূমিকা

১৯৭১ সালে একটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। এটি কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। এর পেছনে রয়েছে আন্দোলন-সংগ্রামের এক দীর্ঘ ইতিহাস। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে শুরু থেকেই সে রাষ্ট্রে বাঙালিদের আত্মীকরণ' নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তার প্রথম প্রকাশ ঘটে। পূর্ব বাংলার (পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান) উপর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর ঔপনিবেশিক ধাঁচের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালিদের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধিকার এবং আরো পরে, স্বাধীনতার দাবি ওঠে। এক্ষেত্রে ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৬-দফা কর্মসূচি ঘোষণা ছিল একটি টার্নিং পয়েন্ট বা মোড় ফেরানো ঘটনা। এরপর ৬-দফা ভিত্তিক বাঙালিদের আন্দোলন দমনে আইয়ুব সরকারের 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের (১৯৬৮), এর প্রতিক্রিয়ায় '৬৯ -এর গণ অভ্যুত্থান ও আইয়ুব খানের পতন, '৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে ৬-দফার ভিত্তিতে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়, নির্বাচনী ফলাফল নস্যাৎ অর্থাৎ বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার জন্য পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ, পরিশেষে, বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের ডাক এবং তাঁর ৭ই মার্চের (১৯৭১) ভাষণে স্বাধীনতার আহবান সমগ্র মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্র রচনা করে। বর্তমান ইউনিটে এসব বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে:

- *পাঠ-১: আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচি (১৯৬৬)।*
- *পাঠ-২: ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান।*
- *পাঠ-৩: ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও এর ফলাফল।*
- *পাঠ-৪: অসহযোগ আন্দোলন এবং ৭ মার্চের ভাষণ।*
- *পাঠ-৫: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ।*

পাঠ - ১

আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচি (১৯৬৬)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক পেশকৃত ৬-দফা কর্মসূচির বর্ণনা দিতে পারবেন;
- বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা কর্মসূচি কেন্দ্রিক আন্দোলন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ৬-দফা কর্মসূচি ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করতে পারবেন।

৬-দফা কর্মসূচি

১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে সকল বিরোধী দলের এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ কনভেনশনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ৬-দফা কর্মসূচি উত্থাপন করেন। ৬-দফা কর্মসূচি সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

দফা-১ : লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত আইন পরিষদের প্রাধান্যসহ সংসদীয় পদ্ধতির সরকার গঠনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

দফা-২ : বৈদেশিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষা ছাড়া সকল বিষয় অঙ্গরাষ্ট্র বা প্রদেশের হাতে ন্যস্ত থাকবে। উল্লেখিত দুটি বিষয় ন্যস্ত থাকবে কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে।

দফা-৩ : পাকিস্তানের দুটি অঞ্চলের জন্য পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রাব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। অথবা সমগ্র দেশে একটি মুদ্রা ব্যবস্থা থাকবে, তবে সেক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচার রোধের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য একটি ফেডারেল ব্যাংকের অধীনে কার্যকরী ব্যবস্থা থাকতে হবে।

দফা-৪ : অঙ্গরাষ্ট্র বা প্রদেশগুলোর কর বা শুল্ক ধার্য করার ক্ষমতা থাকবে। তবে ব্যয় নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এর একটি অংশ পাবে।

দফা-৫ : পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পৃথক হিসাব রাখা হবে। অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা স্ব স্ব অঞ্চলের বা অঙ্গরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আঞ্চলিক সরকার বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ এবং যে কোন চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে।

দফা-৬ : নিজস্ব নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অঙ্গরাষ্ট্রগুলো প্যারা মিলিশিয়া বা আধা সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে পারবে এবং নৌ সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রামে স্থাপন করতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা আন্দোলন

লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলের কনভেনশনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ৬-দফা কর্মসূচি উত্থাপন করেন কিন্তু উক্ত কনভেনশনে তা গৃহীত হয়নি। এধরনের একটি পরিস্থিতির মুখোমুখি যে বঙ্গবন্ধুকে হতে হবে তা তিনি পূর্বেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। আওয়ামী লীগের এ কর্মসূচি মূখ্যত পাকিস্তানি শাসন-শোষণ ও বঞ্চনার মূলে কুঠারাঘাত হানে। লাহোর কনভেনশনে উত্থাপিত ৬-দফা কর্মসূচিকে বঙ্গবন্ধু 'আমাদের (বাঙালির) বাঁচার দাবী' হিসেবে আখ্যায়িত করে তা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে হাজির হন। এরই মাঝে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল (মার্চ, ১৯৬৬) ডেকে বঙ্গবন্ধু ৬-দফা কর্মসূচি অনুমোদন করিয়ে নেন। উক্ত কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৬৬ সালের মধ্য ফেব্রুয়ারি (লাহোর কনভেনশনের অব্যবহিত পরে) থেকে ৬-দফা কর্মসূচির অনুকূলে গণসমর্থন আদায়ের জন্যে কর্মতৎপরতা শুরু হয়। তিন মাসব্যাপী একটানা গণসংযোগ অভিযান চলে। পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে

বঙ্গবন্ধুকে বার বার গ্রেফতার করা হয়; কখনো সিলেটে, কখনো ময়মনসিংহে, কখনো ঢাকায় আবার কখনো বা নারায়ণগঞ্জে।

১৯৬৬ সালে ৬-দফা আন্দোলনে প্রথম তিন মাসেই বঙ্গবন্ধু বেশ কয়েকবার গ্রেফতার হন। একই বছরের ৭ জুন ৬-দফার প্রতি সমর্থন এবং বঙ্গবন্ধুসহ গ্রেফতারকৃত অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে আওয়ামী লীগের ডাকে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘট পালনকালীন সময়ে পুলিশের গুলিতে ঢাকা, টঙ্গী ও নারায়ণগঞ্জে ১৩ ব্যক্তি নিহত হয়। এভাবে পশ্চিম পাকিস্তানী আইয়ুব সরকারের জেল-জুলুম হত্যা-নির্যাতন ৬-দফা আন্দোলনে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটায়। সভা সমাবেশ, ধর্মঘট, পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদির মাধ্যমে ৬-দফা কর্মসূচি বাংলার জনগণের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের বাঁচার দাবিতে পরিণত হয়।

৬-দফা কর্মসূচি ও বাঙালি মধ্যবিত্ত

৬-দফা দাবি তৎকালীন সামগ্রিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রণীত হয়েছিল। আর তা ছিল, পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক ধাঁচের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ভেঙে বাঙালির জাতীয় মুক্তি অর্জন। অন্যকথায়, ৬-দফা কর্মসূচির লক্ষ ছিল ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী নির্বিশেষে বাঙালি জনগণকে জাতীয় মুক্তির চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষায়:

"৬-দফা বাংলার শ্রমিক-কৃষক মুজুর-মধ্যবিত্ত তথা আপামর মানুষের মুক্তির সনদ, ৬-দফা শোষকের হাত থেকে শোষিতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে আনার হাতিয়ার, ৬-দফা মুসলিম-হিন্দু-খ্রিস্টান-বৌদ্ধদের নিয়ে গঠিত বাঙালি জাতির স্বকীয় মহিমায় আত্মপ্রকাশ আর আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের চাবিকাঠি .... ৬-দফার সংগ্রাম আমাদের জীবন মরণের সংগ্রাম।"

৬-দফা কর্মসূচি ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ

পাকিস্তানের শাসন আমলে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মধ্যে যে স্বাধিকার বোধ জন্ম নেয়, সেই পটভূমিতে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে লাহোর কনভেনশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ৬-দফা দাবি উত্থাপন করেন। আইয়ুব সরকারের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত কঠোর। জেনারেল আইয়ুব ৬-দফাকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', 'বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী', 'ধ্বংসাত্মক', 'বৃহত্তর বাংলা প্রতিষ্ঠা'-র কর্মসূচি বলে আখ্যায়িত করেন এবং এ কর্মসূচির প্রবক্তা বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের 'এক নম্বর দুশমন' হিসেবে চিহ্নিত করে ৬-দফা পন্থীদের দমনে 'অস্ত্রের ভাষা' প্রয়োগের হুমকি দেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ এবং এর কর্ণধার বঙ্গবন্ধু আইয়ুব সরকারের হুমকিতে দমে যাবার পাত্র ছিলেন না। এ কর্মসূচি সমগ্র বাঙালির চেতনামূলে বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার কথা বলা হয় নি বটে তবে ৬-দফা বাঙালিদের স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করে তোলে। যে কারণে এটি সম্ভব হয়েছে তা হলো এর ভেতরে বাঙালির জাতীয় মুক্তির বীজ নিহিত ছিল। এক কথায় বলা যায়, ৬-দফা ছিল বাঙালির জাতীয় মুক্তির সনদ। ৬-দফা কেন্দ্রিক আন্দোলনের পথ ধরেই জন্ম নিয়েছে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

সারকথা

১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলের কনভেনশনে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৬-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। পাকিস্তানকে একটি ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষা ছাড়া বাকি সকল ক্ষমতা প্রদেশের হাতে ন্যস্ত, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের জন্য পৃথক মুদ্রাব্যবস্থা প্রবর্তন, অঙ্গরাষ্ট্রের কর বা শুল্ক ধার্য করার ক্ষমতা, বিদেশের সঙ্গে আঞ্চলিক সরকারের বাণিজ্য চুক্তি করার ক্ষমতা এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আধা সামরিক বাহিনী গড়ে তোলা ছিল ৬-দফা কর্মসূচির মূল বক্তব্য। এ কর্মসূচি ঘোষণার পর আওয়ামী লীগের উপর চরম দমন পীড়ন-নির্যাতন নেমে আসে। বঙ্গবন্ধুকে বার পর গ্রেপ্তার বরণ করতে হয়। ৬-দফা ছিল বাঙালিদের জাতীয় মুক্তির সনদ। তাই, আইয়ুব সরকারের নির্যাতন সত্যেও একে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতিসত্তার উত্থান ঘটে। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ৬-দফা কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন

১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা কর্মসূচি কখন পেশ করেন?
   ক. ১৯৬৬ সালের ৫-৬ জানুয়ারি
   খ. ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি
   গ. ১৯৬৬ সালের ৬-৭ মার্চ
   ঘ. ১৯৬৬ সালের ৫-৬ এপ্রিল

২. ৬-দফার কোন কোন দফায় বৈদেশিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়?
   ক. প্রথম দফায়
   খ. দ্বিতীয় দফায়
   গ. তৃতীয় দফায়
   ঘ. ষষ্ঠ দফায়

৩. ৬-দফা আন্দোলনের প্রথম তিন মাসে বঙ্গবন্ধুকে ক'বার গ্রেফতার করা হয়?
   ক. আট বার
   খ. নয় বার
   গ. এগার বার
   ঘ. তিন বার

৪. ৬-দফার সমর্থনে প্রথম কখন পূর্ব বাংলার ধর্মঘট পালিত হয়?
   ক. ১৯৬৬ সালের ৭ এপ্রিল
   খ. ১৯৬৬ সালের ৭ মে
   গ. ১৯৬৭ সালের ৭ জুন
   ঘ. ১৯৬৬ সালের ৭ জুন

সঠিক উত্তর মালা: ১। খ, ২। খ,ঘ, ৩। ক, ৪। ঘ

সংক্ষিপ্ত উত্তর মূলক প্রশ্ন

১. ১৯৬৬ সালের ৭ জুন কি ঘটেছিল?
২. ৬-দফা কর্মসূচির সংগে বাঙালি জাতীয়তাবাদ কীভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৬-দফা কর্মসূচির দফাগুলো কী?
২. ৬-দফা কর্মসূচির সংগে বাঙালি জাতীয়তাবাদ কিভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়?

পাঠ - ২

১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবেন;
- উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- গণ-অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পর্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট

পাকিস্তানি শাসন-শোষণ, নির্যাতন ও নিষ্পেষণ পূর্ব বাংলার জনগণের উপর যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে, ৬-দফা কর্মসূচিভিত্তিক আন্দোলন তত দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এ আন্দোলন দমনে আইয়ুব সরকারের 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র (১৯৬৮) আশ্রয় গ্রহণ এক বিস্ফোরণমুখ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায়। এ মামলায় বঙ্গবন্ধুকে এক নম্বর আসামী করা হয়। ঠিক এ সময়ে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন ও মতিয়া উভয় গ্রুপ), সরকারি ছাত্র সংগঠন জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের 'দোলন গ্রুপ' এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ঐক্যবদ্ধ হয়ে আইয়ুব বিরোধী মঞ্চ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনপূর্বক ৬-দফা কর্মসূচির প্রতি সর্বাত্মক সমর্থনসহ ১১-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে, যা আন্দোলনে নতুন গতির সঞ্চার করে। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার এবং বঙ্গবন্ধুসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন আরম্ভ করে। বস্তুত ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৯৬৯ সালের মার্চ পর্যন্ত, এ পাঁচ মাস সমগ্র পূর্ব বাংলায় গণবিদ্রোহ দেখা দেয়। একই সময় পশ্চিম পাকিস্তানেও আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হওয়ার পর ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (৬-দফা পন্থী), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ), নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি, জমিয়ত-উল-উলামা-ই-ইসলাম, নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগ (মমতাজ দৌলতানা), ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট, জামায়াত-ই-ইসলামি, পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান) -এ ৮টি রাজনৈতিক দল ৮-দফা দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি (DAC-ডাক) গঠন করে। ৮-দফা দাবিনামার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীনে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান, অবিলম্বে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ক্ষমতাসীন আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে এতদিন আন্দোলনে মূলত ছাত্র সমাজের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু ১৯৬৯ এর মাঝামাঝিতে অন্যান্য গোষ্ঠী বিশেষতঃ কৃষক, শিল্প শ্রমিক, রাজনৈতিক কর্মী সকলে আন্দোলনে নিজেকে সম্পৃক্ত করে। ফলে আইয়ুব বিরোধী গণ-আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানের রূপ পরিগ্রহ করে।

১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানের কারণ

গণতন্ত্রের পূর্ণ বাস্তবায়ন, পাকিস্তানি সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্ব বিলোপ, পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যকার বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ, যাবতীয় গণবিরোধী শক্তির মূলোৎপাটন এবং সর্বোপরি স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৬৯ সালে যে গণ-অভ্যুত্থানের সূচিত হয় তার প্রধান কারণগুলো ছিল নিম্নরূপ:

১. ১৯৫৮ সালের ঘোষিত সামরিক শাসনের ফলে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়। পূর্ব বাংলার জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পর্যদুস্ত হয় পাকিস্তানি সামরিক বেসামরিক আমলাতন্ত্রের অগণতান্ত্রিক আচরণে। অবরুদ্ধ জনতা ক্ষোভে ফেটে পড়ে, সূচিত হয় গণ-অভ্যুত্থান।

২. পূর্ব বাংলার বাঙালিদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার প্রতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর চরম ঔদাসীন্য ও বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গী বাঙালিদের প্রান্তিকীকরণ করে। ফলে সৃষ্টি হয় গণ-অভ্যুত্থানের।

৩. পাকিস্তানে গণবিরোধী ও অশুভশক্তির বিশেষত মৌলিক গণতন্ত্রীদের ক্রমাগত ক্ষমতাবৃদ্ধি ও ক্ষমতার অপব্যবহার 'রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের সুযোগ বন্ধ' ইত্যাদি গণঅভ্যুত্থানকে ত্বরান্বিত করে।

৪. পাকিস্তান রাষ্ট্রে পূর্ব বাংলার বাঙালিদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বকীয়তা বজায় রাখা দুরূহ হয়ে পড়ে, যা কার্যত উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মুখ্য কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

৫. বাঙালিদের স্বার্থের আপোসহীন প্রতিনিধি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও অপর ৩৪ জনের বিরুদ্ধে আইয়ুব সরকারের 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের এবং বিশেষ ট্রাইবুনালে তাঁদের বিচার অনুষ্ঠান উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানকে অনিবার্য করে তোলে।

গণঅভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পর্ব

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রাত্যহিক কার্যবিবরণী যতই বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত হতে থাকে, বাঙালিরা ততই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পূর্ব বাংলার আপামর জনতা ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন, কার্ফু ভঙ্গ, পুলিশ-ই.পি.আর-সেনাবাহিনী উপেক্ষা করে রাস্তায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে। চতুর্দিক প্রকম্পিত করে ধ্বনিত হতে থাকে গগনবিদারী শ্লোগান: 'জেলের তালা ভাঙ্গবো, শেখ মুজিবকে আনবো', 'তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব, শেখ মুজিব', 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা' ইত্যাদি। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান (আসাদ)-এর মৃত্যু, ২৪ জানুয়ারি পুলিশের বুলেটে নবকুমার ইনস্টিটিউটের দশম শ্রেণীর ছাত্র মতিউরের মৃত্যু, ১৫ ফেব্রুয়ারি বন্দী অবস্থায় ঢাকার সেনানিবাসে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হকের গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হওয়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি ই.পি.আর-এর গুলিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও রসায়ন বিভাগের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহার শাহাদত বরণ ইত্যাদি মর্মান্তিক ঘটনা সমগ্র পূর্ব বাংলায় প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দেয়। আইয়ুব শাসন বিরোধী উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান পায় চূড়ান্তরূপ।

শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রদান

আইয়ুব বিরোধী গণঅভ্যুত্থান যখন চূড়ান্ত পর্বে উপনীত, তখন দিশেহারা হয়ে জেনারেল আইয়ুব প্রথমে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্যারোল (Parole)-এ মুক্তিদানে তার সম্মতির কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু শেখ মুজিব তাতে রাজী হননি। অবশেষে ২২ ফেব্রুয়ারি জেনারেল আইয়ুব তাঁকে (শেখ মুজিবুর রহমানকে) নিঃশর্ত মুক্তিদানে ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারে বাধ্য হন। পরের দিন অর্থাৎ ২৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লাখো ছাত্র-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে এক ঐতিহাসিক গণসম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)-এর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমদ কর্তৃক কারামুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। অতঃপর ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ জেনারেল আইয়ুব ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হন।

সারকথা

১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করলে বাঙালিদের মধ্যে দ্রুত আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এর মোকাবেলা করতে আইয়ুব সরকার ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামি করে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করেন। মামলার অভিযোগ ছিল ভারতের সহযোগিতায় সশস্ত্র পন্থায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করা। এ মামলার উদ্দেশ্য ছিল ৬-দফা ভিত্তিক বাঙালিদের স্বাধিকার আন্দোলন নস্যাৎ করা। আইয়ুব সরকারের এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাঙালিরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ ১১-দফা কর্মসূচি দিয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ব্যানারে আইয়ুব - বিরোধী আন্দোলনের অগ্রভাগে এসে দাঁড়ায়। পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদ ও দশম শ্রেণীর ছাত্র মতিউরের মৃত্যু, বন্দী অবস্থায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা, ই.পি.আর -এর গুলিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহার নিহত হওয়ার ঘটনা ইত্যাদি আন্দোলনের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়। সংঘটিত হয় ৬৯-এর গঅভ্যুত্থান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সকল আসামীকে নিঃর্শত মুক্তি দেওয়াহয় এবং মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এর কিছুদন পর আইয়ুব সরকারের পতন ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন

১. ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি বা ডাক কখন গঠিত হয়?
   ক. ১৯৬৮ সালের ১৮ এপ্রিল
   খ. ১৯৬৯ সালের ১৯ জুন
   গ. ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি
   ঘ. ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি

২. শহীদ মতিউর কোন্ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন?
   ক. ঢাকা ল্যাবরেটরী হাইস্কুল
   খ. আইডিয়াল স্কুল
   গ. মতিঝিল হাইস্কুল
   ঘ. নবকুমার ইনস্টিটিউশন

৩. ড. শামসুজ্জোহা কোন্ তারিখে শাহাদত বরণ করেন?
   ক. ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি
   খ. ১৯৬৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি
   গ. ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি
   ঘ. ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি

৪. কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ঐতিহাসিক গণসম্বর্ধনায় কোন তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়?
   ক. ১৯৬৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি
   খ. ১৯৬৯ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি
   গ. ১৯৬৯ সালের ৩০ মার্চ
   ঘ. ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি

সঠিক উত্তর মালা: ১। গ, ২। ঘ, ৩। খ, ৪। ঘ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. কখন এবং কিভাবে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়?
২. ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি বা ডাক কখন ও কিসের ভিত্তিতে গঠিত হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের কারণসমূহ কী ছিল?

পাঠ - ৩

১৯৭০ সালের নির্বাচন ও এর ফলাফল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে অপনি—

- ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে আইনগত কাঠামো আদেশ বা এল.এফ. ও জারিকরণ সম্পর্কে বলতে পারবেন:
- ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পটভূমি ও নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলোর বর্ণনা দিতে পারবেন:
- ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের নির্বাচনী ইস্যু ও ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন:
- ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

আইনগত কাঠামো আদেশ

১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে কতিপয় শাসনতান্ত্রিক পদক্ষেপসহ আইনগত কাঠামো আদেশ বা এল.এফ.ও (Legal Framework Order-LFO) জারি করেন। আইনগত কাঠামো আদেশের বিধানগুলো নিম্নরূপ:

ক. সাধারণ নির্বাচন সংক্রান্ত বিধান :
   ১. সর্বজনীন ভোটাধিকার;
   ২. 'এক ব্যক্তি, এক ভোট' নীতি;
   ৩. প্রত্যেক প্রদেশ বা অঙ্গরাষ্ট্রের জন্য জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন সংখ্যা বন্টন।

খ. জাতীয় পরিষদের গঠন সংক্রান্ত বিধান :
   ১. জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা ৩১৩ নির্ধারণ;
   ২. এলাকাভিত্তিক সাধারণ আসন সংখ্যা ৩০০ এবং মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ১৩ নির্ধারণ;
   ৩. জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রদেশ বা অঙ্গরাষ্ট্রের আসন সংখ্যার বণ্টন নিম্নরূপ :

পূর্ব পাকিস্তান	:	১৬২+৭	=১৬৯
পাঞ্জাব	:	৮২+৩	= ৮৫
সিন্ধু	:	২৭+১	= ২৮
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	:	২৫+১	= ২৬
বেলুচিস্তান	:	৪+১	= ০৫

গ. সংবিধান প্রণয়ন সংক্রান্ত বিধান ঃ
   ১. পাকিস্তান হবে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র;
   ২. দেশে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত থাকবে;
   ৩. প্রত্যেক প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যের জন্য সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন, কেন্দ্রের হাতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা এবং দেশের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখন্ডত্ব রক্ষা;
   ৪. নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ কর্তৃক সংবিধান প্রণয়নের নির্ধারিত সময়সীমা ১২০ দিন ধার্য। নির্ধারিত সময়সীমায় সংবিধান প্রণয়নে ব্যর্থ হলে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জাতীয় পরিষদ ভেঙ্গে দেওয়া এবং নতুন সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন;
   ৫. জাতীয় পরিষদের প্রতিনিধিবৃন্দ কর্তৃক গৃহীত সংবিধান রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া আবশ্যকীয় হবে।

আইনগত কাঠামো আদেশে কার্যত প্রেসিডেন্টের হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে জারিকৃত এই আদেশের তীব্র সমালোচনা করা হয়।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পটভূমি ও অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল :

১৯৭০ সালের নির্বাচনই স্বাধীনতা-উত্তর পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এবং যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতিতে প্রথম সাধারণ নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে ৫ অক্টোবর পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদগুলোর নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু উক্ত তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় নি। পরে তা যথাক্রমে ৭ ডিসেম্বর পুনঃনির্ধারিত হয়। ইতোমধ্যে ১২ নভেম্বর পূর্ব বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলে আকস্মিক এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানলে ঐ সব এলাকার নির্বাচন পিছিয়ে ১৭ই জানুয়ারি ১৯৭১-এ নেওয়া হয় এবং যথারীতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং বেশকিছু নির্দলীয় প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের সংখ্যা দু'ডজনের মতো। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলগুলো হচ্ছে: আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পি.পি.পি), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ (ওয়ালী খান), মুসলিম লীগের বিভিন্ন গ্রুপ, জামায়াত-ই-ইসলামি, জমিয়তে উলামা-ই-ইসলাম, জমিয়তে উলামা-ই-পাকিস্তান, নিজামে ইসলাম, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পি.ডি.পি.) ইত্যাদি। এর মধ্যে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল হচ্ছে, আওয়ামী লীগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি। তবে এ নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য দিক হলো, কোন রাজনৈতিক দলই এলাকাভিত্তিক ৩০০টি আসনের সব কটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করেনি। উপরন্তু পূর্ব বাংলার এক সময়ের জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ (ভাসানী) 'ভোটে মুক্তি আসবে না' শ্লোগান তুলে নির্বাচন বয়কট করে।

নির্বাচনী ইস্যু

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইস্যু ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ৬-দফা। আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনের পূর্বে জাতির উদ্দেশ্যে ১৯৭০ সালের ২৮ অক্টোবর রেডিও-টেলিভিশন ভাষণ এবং নির্বাচনী প্রচার অভিযান কালে এ সাধারণ নির্বাচনকে ৬-দফা কর্মসূচির উপর 'গণভোট' বলে আখ্যায়িত করেন।

পূর্ব বাংলার উপর দুই দশকের অধিক সময়কালব্যাপী পশ্চিম পাকিস্তানি শাসন-শোষণ-বঞ্চনা, আঞ্চলিক বৈষম্য, ১২ নভেম্বর পূর্ব বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানা প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের সময় কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদাসিন্য ইত্যাদি আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারে গুরুত্ব সহকারে স্থান পায়। আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রকাশিত নির্বাচনী ইশতেহারে ৬-দফা ও ১১-দফা গুরুত্ব সহকারে স্থান পায়।

অপরদিকে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির নির্বাচনী শ্লোগান ছিল: 'ইসলাম আমাদের বিশ্বাস, গণতন্ত্র আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সমাজতন্ত্র আমাদের অর্থনীতি'। পিপলস্ পার্টির প্রচারনার মূল বিষয়বস্তু ছিল শক্তিশালী কেন্দ্র ইসলামি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং অব্যাহত ভারত বিরোধিতা।

এ ছাড়া, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য ইসলামপন্থী দল বা গ্রুপ পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির মত ইসলামি সংবিধান, শক্তিশালী কেন্দ্র এবং ভারত বিরোধিতার উপর তাদের নির্বাচনী প্রচারে গুরুত্ব আরোপ করে।

নির্বাচনী ফলাফল

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে ১৬২ টি জাতীয় পরিষদের এলাকা ভিত্তিক আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন এবং প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৭২.৫৭ ভাগ ভোট লাভ করে। বাকি ২টি আসনের মধ্যে একটিতে জয়লাভ করেন পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রধান নুরুল আমিন এবং অপরটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী রাজা ত্রিদিব রায়। জাতীয় পরিষদে পূর্ব বাংলার জন্য সংরক্ষিত ৭টি মহিলা আসনের সব কয়টিতে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। সর্বমোট ৩১৩ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৭টি। পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। প্রাদেশিক পরিষদের মোট ৩০০টি এলাকাভিত্তিক আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ

২৮৮টি আসন লাভ করে। প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৮৯ ভাগ আওয়ামী লীগের অনুকূলে যায়। অন্যান্য ১২টি আসনের ৯টিতে জয়লাভ করে স্বতন্ত্র প্রার্থী, ২টিতে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি এবং একটিতে জামায়ত-ই-ইসলামি জয়লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ১০টি আসনের সব কয়টিতে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। ফলে প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগের দলীয় আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯৮টি।

অপরদিকে, জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ১৩৮টি এলাকা ভিত্তিক আসনের মধ্যে ৮৩টি আসনে জয়লাভ করে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি বা পিপিপি। হিসেব অনুযায়ী প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪২.২ ভাগ ভোট পিপিপি-র অনুকূলে পড়ে। বাকী ৫৫টি আসনের ৯টিতে মুসলীম লীগ (কাইউম খান), ৭টিতে মুসলীম লীগ (কাউন্সিল), ৭টিতে জমিয়তে উলামায়-ই-ইসলাম, ৬টিতে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ (ওয়ালী খান), ৭টিতে জমিয়তে উলামায়-ই-ইসলাম, ৪টিতে জামায়াত-ই-ইসলামি, ২টিতে মুসলিম লীগ (কনভেনশন) এবং ১৩টিতে নির্দলীয় প্রার্থী জয়লাভ করে। পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য সংরক্ষিত ৬টি মহিলা আসনের ৫টিতে পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি এবং ১টিতে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ (ওয়ালী খান) জয়লাভ করে। মহিলা আসনসহ পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির মোট আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৮টি।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভুত হয়। ৮৮টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে স্থান লাভ করে পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি। সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলে লক্ষণীয় বিষয় হলো প্রধান এ দুটি রাজনৈতিক দলের কোনটিই দেশের উভয় অংশে আসন লাভ করতে ব্যর্থ হয়। মোদ্দাকথা আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে এবং পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি পূর্ব বাংলায় কোন আসনই জয়লাভ করতে পারে নি।

নির্বাচনে জনগণ পূর্ব পাকিস্তানে ৬-দফা ভিত্তিক আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের পক্ষে এবং পশ্চিম পাকিস্তান শক্তিশালী কেন্দ্র, ইসলামি ব্যবস্থা প্রবর্তন ও ভারত বিরোধিতার পক্ষে নির্বাচনী রায় প্রদান করে।

সারকথা

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ছিল অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রথম ও শেষ নির্বাচন। এ নির্বাচনে প্রধান দুটি দল ছিল, পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি। ৬-দফার ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ৩১৩ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি (৭টি মহিলা আসনসহ) আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পূর্ব বাংলার জন্য বরাদ্দকৃত ১৬২টি এলাকা ভিত্তিক আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬০টি আসন লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনেও ৩১০ টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৮টি আসন পেয়ে এক বিপুল বিজয় অর্জন করে। অপরদিকে ভুট্টোর পিপলস্ পার্টি জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ১৪৪ টি আসনের মধ্যে ৮৮টি (৫টি মহিলা আসনসহ) আসনে বিজয়ী হয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। তবে দুটি দলের কোনটিই দেশের উভয় অংশে আসন লাভে সক্ষম হয় নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন

১. জেনারেল ইয়াহিয়া কখন আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষণা করেন?
   - ক. ১৯৭০ সালের ১৭ মার্চ
   - খ. ১৯৭০ সালের ২২ মার্চ
   - গ. ১৯৭০ সালের ২৭ মার্চ
   - ঘ. ১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ

২. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের মোট আসন সংখ্যা কত ছিল?
   - ক. ২১৩টি
   - খ. ২৬৩টি
   - গ. ৩১৩টি
   - ঘ. ১৮৮টি

৩. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ মোট কতটি আসনে জয়লাভ করে?
   - ক. ৮৮টি
   - খ. ১৬৭টি
   - গ. ২৮৮টি
   - ঘ. ৩১৩টি

৪. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নি?
   - ক. ন্যাপ (ওয়ালী খান)
   - খ. ন্যাপ (ভাসানী)
   - গ. মুসলিম লীগ (কনভেনশন)
   - ঘ. মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)

উত্তর মালা: ১। ঘ, ২। গ, ৩। খ, ৪। খ

সংক্ষিপ্ত উত্তর মূলক প্রশ্ন

১. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মূল ইস্যু কী ছিল?
২. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে ভুট্টোর পিপলস পার্টির মূল ইস্যু কী ছিল?
৩. প্রেডিসেন্ট ইয়াহিয়া খানের 'আইনগত কাঠামো আদেশে' সাধারণ নির্বাচন সংক্রান্ত কী বিধান করা হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য কী?

পাঠ - ৪

অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- অসহযোগ আন্দোলন ও বাঙালির জাতীয় উত্থান সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ৭ মার্চের ভাষণের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতা হারাবার ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগ অধিক আসনে জয়লাভ করবে এ ধারণা কমবেশি সবাই পোষণ করেছিল কিন্তু একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে জনগণের ম্যান্ডেট পাবে পশ্চিমা শাসকেরা তা ভাবতে পারে নি। তাহলে হয়তো তারা ভিন্ন কূটকৌশলের আশ্রয় নিত। আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মধ্য দিয়ে বাঙালির রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব অর্জন এবং ৬-দফা ভিত্তিক সংবিধান প্রণয়নের বিষয়টি নিশ্চিত হয়, যার কোনটিই পাকিস্তানি সামরিক-বেসামরিক আমলা শাসকগোষ্ঠীর নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না। ফলে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের অব্যবহিত পরে শুরু হয় নতুন প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। সামরিক-বেসামরিক আমলা শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে এ প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে সহায়তা প্রদান করে পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিশেষত পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির জুলফিকার আলী ভুট্টো।

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করেছিলেন। নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তিনি পাকিস্তানের 'ভাবী প্রধানমন্ত্রী' হিসেবেও আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু এ সবই ছিল বাইরে থেকে লোক দেখানো। ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছিল কিভাবে নির্বাচনের রায় বানচাল করা যায়। অন্যদিকে ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ দলীয় নব নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের এক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের সদস্যবৃন্দ ঐতিহাসিক ৬-দফা এবং ছাত্রসমাজের প্রাণের দাবি ১১-দফার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না করে পাকিস্তানের সংবিধান রচনার শপথ গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান যখন পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যথার্থঅর্থে আশার সঞ্চার করছিল তখন জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানে 'দুটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল' (আওয়ামী লীগ ও পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি) এ তত্ত্ব হাজির করেন। সংবিধানের প্রশ্নে দুটি দলের মধ্যে একটি সমঝোতা না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান না করার কথা তিনি ঘোষণা করেন। এ ঘোষণার পেছনে ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তার যোগসাজসের বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার দু'দিন পূর্বে ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতকরণের খবর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা রাজপথে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বাঙালির জাতীয় উত্থানে এক নব অধ্যায় সূচিত হয়।

অসহযোগ আন্দোলন ও বাঙালির জাতীয় উত্থান

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অর্নিদিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সমগ্র পূর্ব বাংলায় হরতালের ডাক দেন। কার্যত ১ মার্চ থেকে পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ২ মার্চ রাতে কার্ফু জারি করা হয়। ছাত্রজনতা কার্ফু ভঙ্গ করে। সেনাবাহিনী গুলি চালায়। আন্দোলনের প্রতিটি দিনে শতশত লোক হতাহত হয়। প্রতিবাদে প্রতিরোধে জেগে ওঠে বাংলাদেশ। উত্থান ঘটে একটি জাতির। বাঙালি জাতির। চারদিকে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহের শ্লোগান ছিল : 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।'

১৯৭১ সালের ১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্র-জনতার সমাবেশে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন, ৩ মার্চ পল্টনের জনসভায় বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে ছাত্র সমাজের 'স্বাধীন বাংলাদেশের ইশতেহার পাঠ', 'স্বাধীন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন' ২৩ মার্চ পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবসে পূর্ব বাংলার সর্বত্র পাকিস্তানের পতাকার পরিবর্তে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

১৯৭১ সালের ২ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে সারা বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ পালিত হয়। পূর্ব বাংলার সকল সরকারি, বেসরকারি অফিস, সেক্রেটারিয়েট, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, হাইর্কোট, পুলিশ প্রশাসন, ব্যাংক-বীমা, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন পাকিস্তানি সরকারের নির্দেশ অমান্য ও অগ্রাহ্য করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলে। পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানি প্রশাসন সম্পূর্ণ অকার্যকর হয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠলেন কার্যত সরকার প্রধান। বঙ্গবন্ধুর আবাসস্থল ধানমন্ডীর ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িটি পরিণত হয় সকল নির্দেশের উৎসস্থান অর্থাৎ সরকার প্রধানের কার্যালয়।

৭ মার্চের ভাষণ ও এর প্রেক্ষাপট

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বাঙালিদের জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন। এ দিনে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) লক্ষ লক্ষ জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশে এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ইতিহাস খ্যাত এ ভাষণই ৭ মার্চের ভাষণ। ২ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর আহবানে সারা পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অসহযোগ চলছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য এ ছিলো অন্তিম মুহূর্ত। অন্যদিকে স্বাধীনতার চেতনায় প্রদীপ্ত বাঙালি জাতির জন্য এ ভাষণ ছিল পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের নাগপাশ ছিন্ন করে জাতীয় মুক্তি বা কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে চূড়ান্ত সংগ্রামের সূচনা।

মাত্র ১৮ মিনিটের এক ভাষণ। বঙ্গবন্ধু তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ তেজস্বী ভাষণে পাকিস্তানের ২৪ বছরের রাজনীতি ও বাঙালিদের বঞ্চনা করার ইতিহাস ব্যাখ্যা, পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে বাঙালিদের দ্বন্দ্বের স্বরূপ উপস্থাপন, অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি বিশ্লেষণ ও বিস্তারিত কর্মসূচি ঘোষণা, সারা বাংলায় প্রতিরোধ গড়ে তোলার নির্দেশ, প্রতিরোধ সংগ্রাম শেষাবধি মুক্তিযুদ্ধে রূপ নেয়ার ইঙ্গিত, শত্রুর মোকাবেলায় গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন, যে কোন উস্কানির মুখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার পরামর্শদান ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরার পর ঘোষণা করেন:

> "ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাআল্লাহ। .... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।"

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল একজন দক্ষ কৌসুলির সুনিপুন বক্তব্য উপস্থাপন। বিশেষত ভাষণের শেষ পর্যায়ে তিনি 'স্বাধীনতার' কথা এমনভাবে উচ্চারণ করেন যাতে ঘোষণার কিছু বাকিও থাকলো না, আবার তাঁর বিরুদ্ধে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার অভিযোগ উত্থাপন করাও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর জন্য আদৌ সহজ ছিল না। মনে করা যায় বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণ ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা। তবে পরিস্থিতি বিবেচনায় সরাসরি ভাবে তা ঘোষণা না করে তিনি কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

বাস্তবে ২৫ মার্চ, ১৯৭১ রাতের বেলায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালিদের উপর অতর্কিতে বর্বর ও রক্তক্ষয়ী আক্রমন চালয়। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণায় শুরু হয় মুক্তি যুদ্ধ। ৯ মাসব্যাপী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বঙ্গবন্ধুর এ কৌশল বা অবস্থান বাংলাদেশ সংগ্রামের পক্ষে ইতিবাচক ফল বয়ে আনে।

সারকথা

১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার গঠনের কথা। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাদের কায়েমী স্বার্থে বাঙালিদের সরকার গঠনের সুযোগ দিতে কিছুতেই রাজি ছিল না। তাই নির্বাচনের ফলাফল নস্যাৎ করে নিজেদের শাসন-শোষণ অব্যাহত রাখার হীন উদ্দেশ্যে তারা ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়। এরই অংশ হিসেবে ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন একতরফাভাবে স্থগিত ঘোষণা করা হয়। অপরদিকে আলাপ-আলোচনার নাম করে সময় নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জাহাজভর্তি অস্ত্র ও সৈন্য আনতে থাকে। পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে ১ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ২৫ মার্চ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানি প্রশাসন সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লক্ষ জনতার উত্তাল জনসমুদ্রে 'মুক্তি' ও স্বাধীনতা'র সংগ্রামের আহবান জানান। শত্রুর বিরুদ্ধে তিনি ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ একটি মূল্যবান দলিল। এটি ছিল বস্তুত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা। ২৫ মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি বাহিনী সশস্ত্র আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়লে বঙ্গবন্ধু সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। ৯ মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যদিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন

১. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কখন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করেন?
   - ক. ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর
   - খ. ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি
   - গ. ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ
   - ঘ. ১৯৭০ সালের ৩ মার্চ

২. বঙ্গবন্ধুর আহবানে কোন সময় পূর্ব বাংলায় অসহযোগ আন্দোলন চলে?
   - ক. ২-২৫ জানুয়ারি ১৯৭১
   - খ. ২-২৫ মার্চ ১৯৭১
   - গ. ৫-২৬ মার্চ ১৯৭১
   - ঘ. ৭-২৫ মার্চ ১৯৭০

৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় কখন স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয়?
   - ক. ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
   - খ. ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০
   - গ. ২৩ মার্চ ১৯৭১
   - ঘ. ১ মার্চ ১৯৭১

উত্তরমালা: ১. গ, ২. খ, ৩. ঘ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণের বিষয়বস্তু কী ছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি সম্বন্ধে কী জানেন?
২. ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে কিভাবে বাঙালির জাতির উত্থান ঘটে?

পাঠ - ৫

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

উদ্দেশ্য
এই পাঠ শেষে অপনি-

- ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- মুজিবনগর সরকার গঠনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন।

বাঙ্গালি জাতির ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধ সর্বাপেক্ষা গৌরবময় ঘটনা। ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালিরা একটি স্বাধীন জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ রাষ্ট্র। দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং তাদের এদেশীয় এজেন্টদের গণহত্যার শিকার হয় ত্রিশ লক্ষ মানুষ। এক কোটি লোক শরণার্থী হিসাবে ভারত গমন করতে বাধ্য হয়। এ ছাড়া অপরিমেয় সম্পদহানি ঘটে। অগণিত মা-বোন সম্ভ্রম হারান। জাতিসংঘের এক হিসাব মতে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংগঠিত গণহত্যার হার পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বোচ্চ। কিন্তু এত হত্যা এবং ধ্বংসও বাঙ্গালির স্বাধীনতার স্পৃহাকে স্তব্ধ করতে পারে নি। '৭১ এর মার্চ মাসে যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই জনগণ প্রাথমিক অসংগঠিত অবস্থা কাটিয়ে উঠে। পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধারা প্রবল বিক্রমে শত্রু বাহিনীর উপর আক্রমণ শুরু করে। সারা দেশব্যাপী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধকে অপরিহার্য পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে শরীক হয়ে এই যুদ্ধকে নতুন মাত্রা দান করে। বাঙালি জাতির অপরিসীম সাহস ও ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধে ভারত ও তৎকালীন সোভিয়েট ইউনিয়ন সকল দিক থেকে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করেছিল। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন এর বিরোধিতা করে। জামাতে ইসলামী ও মুসলিম লীগের নেতা-সমর্থকরা রাজাকার, আল বদর, আল শামস্ বাহিনী গঠন করে পাক হানাদার বাহিনীর পক্ষ হয়ে গণহত্যা, অগ্নি সংযোগ, নারী ধর্ষণের মতো জঘন্য ও মানবতা বিরোধী অপরাধ সংঘটিত করেছিল। পাকিস্তানী বাহিনী তাদের হাতে অস্ত্রও তুলে দিয়েছিল। এই বাহিনীর সদস্যরা বিজয় দিবসের প্রাক্কালে ১৪ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপক, সাংবাদিক, লেখক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কবি, সাহিত্যিককে ধরে নিয়ে ঢাকার রায়ের বাজার ও মিরপুরে নৃশংসভাবে হত্যা করে বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করতে তৎপর হয়েছিল। এখানে একটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মুক্তিযুদ্ধ আকস্মিক কোন ঘটনা নয়। পাকিস্তানী শাসকদের অন্যায় শাসন-শোষণের অবসান এবং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত দীর্ঘদিনের আন্দোলন সংগ্রামেরই সফল পরিণতি গৌরবজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠোমোয় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত কখনো বাঙ্গালিদের নায্য অধিকারগুলো পূরণ করা যায় নি। বরং আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক- সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে। রাষ্ট্রিক শোষণের শিকার বাঙ্গালিরা শুরু থেকে সকল বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং সংগঠিত হয়। বায়ান্নর মহান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তর এর সাধারণ নির্বাচনে বাঙ্গালিদের জয়লাভ, একাত্তরের মার্চ মাসের অসহযোগ আন্দোলন এসবই স্বাধিকার আদায়ের দৃষ্টান্ত। এসব আন্দোলন সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় সংগঠিত হয় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট

পাকিস্তানী শাসকদের সব অনুমান ব্যর্থ করে আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙ্গালিদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বায়ত্তশাসনের লক্ষে পূর্ব বাংলার জনগণ আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে জয়ী করে। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় রাষ্ট্র পরিচালনায় বাঙালিদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ ঘোষণা করেন যে, ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। এ ঘোষণার অন্তরালে ইয়াহিয়া খানের সামরিক চক্র জুলফিকার আলী ভুট্টোর সহায়তায় বাঙালিদের ক্ষমতার বাইরে রাখার চক্রান্ত শুরু করেন। অধিবেশন শুরুর মাত্র দু'দিন পূর্বে ১ মার্চ ১৯৭১ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য

স্থগিত ঘোষণা করা হয়। ষড়যন্ত্রমূলক এই অগণতান্ত্রিক ঘোষণার সাথে সাথেই বাঙালিদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। জনগণ রাজপথে নেমে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সরকারি সকল নিষেধাজ্ঞা অমান্য করতে শুরু করে। পাকিস্তান রাষ্ট্রকে চূড়ান্ত প্রত্যাখানের প্রতীক হিসাবে পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে দেয়।

পূর্ব পাকিস্তানে জনগণের দাবির মুখে ইয়াহিয়া খান ৬ মার্চ ঘোষণা করেন যে, ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে কিন্তু এর পূর্বে সংসদীয় দলগুলোর বৈঠকের প্রস্তাব দেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন এবং ৭ মার্চ রেসকোর্সের ঐতিহাসিক জনসভায় আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। বিভিন্ন বাস্তব জটিলতার কারণে সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা না দিলেও তিনি সামরিক আইন প্রত্যাহার, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে প্রেরণ, সাধারণ জনগণকে হত্যার তদন্ত এবং জন প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার জোর দাবি জানান। তিনি সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করেন। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু মুজিব ঘোষণা করেন, " এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

৭ মার্চের ভাষণের পর থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশ পালন করে পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকে। তিনি পূর্ব বাংলার প্রকৃত শাসকে পরিণত হন। জনসাধারণের সার্বিক অসহযোগিতায় ইয়াহিয়া খানের সরকার অচল হয়ে যায়। অসহযোগ আন্দোলনের কারণে ভীত হয়ে ইয়াহিয়া খান উদ্ভূত সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে ১৫ মার্চ ঢাকায় আসেন এবং ২৪ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে আলোচনা চালান।

স্বাধীনতার ঘোষণা

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর সশস্ত্র আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মধ্যরাতে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী ২৬ মার্চ প্রত্যুষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরাসরি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। একই ঘোষণায় তিনি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বস্ব নিয়ে প্রতিরোধের নির্দেশ দেন। এতে বলা হয়:

> "This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved."

(সূত্র: হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: তৃতীয় খন্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২, পৃ: ১)

অর্থাৎ "এ আমার শেষবাণী। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ তোমরা যে যেখানে থাকো, তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা নিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার বাহিনীর প্রতিরোধ করো।"

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার ইংরেজি বার্তাটি সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তৎকালীন ইপিআর-এর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে চট্টগ্রাম পৌঁছে দেওয়া হয়। এটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র (চট্টগ্রাম) থেকে বার বার প্রচার করা হয় এবং লিফলেট আকারে বিলি করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের দলিলেও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর এই স্বাধীনতা ঘোষণা একই বেতার কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা ও জাতীয় পরিষদ সদস্য এম. এ. হান্নান ও আবুল কাশেম সন্দ্বীপসহ আরো কয়েকজন একাধিকবার পাঠ করেন। ২৭ মার্চ মেজর জিয়া (জিয়াউর রহমান) বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সরকার গঠন সম্পর্কিত আরেকটি ঘোষণা দেন।

(সূত্র: হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: তৃতীয় খন্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২, পৃ: ২।

মুজিবনগর সরকার গঠন

মুক্তিযুদ্ধকে সুষ্ঠুভাবে সংঘটিত, পরিচালিত ও রাজনৈতিক রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, তাঁর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে একটি আনুষ্ঠানিক সরকার গঠনের ঘোষণা দেন। এছাড়া, একটি 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র'ও তারা গ্রহণ করেন। ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহাকুমার (তৎকালীন) বৈদ্যনাথ তলায় ('মুজিবনগর' নামে খ্যাত) দেশি-বিদেশি সাংবাদিক ও স্থানীয় বিপুল সংখ্যক জনগণের উপস্থিতিতে নবগঠিত সরকার (যা মুজিবনগর সরকার' নামে, পরিচিত) আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। একই অনুষ্ঠানে জনপ্রতিনিধিদের পক্ষে অধ্যাপক ইউসুফ আলী এম এন এ 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' পাঠ করেন, যা বাংলাদেশের স্বাধীনতার 'সাংবিধানিক ঘোষণা' ('Constitutional Proclamation') হিসেবে চিহ্নিত। এতে বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণাকে অনুমোদন করা হয়।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে জনগণের সুস্পষ্ট 'ম্যান্ডেট' পেয়ে মেজরিটি পার্টির নেতা ও বাঙালি জাতির মুখপাত্র হিসেবে একমাত্র বঙ্গবন্ধুরই বাংলাদেশের 'স্বাধীনতা ঘোষণার' বৈধ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ছিল। তাই, বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চের ঘোষণা অনুযায়ী ঐদিনটিকে আমরা স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করে থাকি। বঙ্গবন্ধুকে প্রধান করে মুজিবনগর সরকার গঠন এবং স্বাধীনতার 'সাংবিধানিক ঘোষণা'র পর আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বৈধ নেতৃত্ব ও আইনগত ভিত্তি লাভ করে।

মুজিব নগর সরকারের গঠন নিম্নরূপ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	-	রাষ্ট্রপতি
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	-	উপরাষ্ট্রপতি
তাজউদ্দিন আহমদ	-	প্রধানমন্ত্রী
খন্দকার মোস্তাক আহমেদ	-	পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী
ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী	-	অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রী
এ এইচ এম কামারুজ্জামান	-	স্বরাষ্ট্র, যোগাযোগ ও ত্রাণ মন্ত্রী

এছাড়াও কর্নেল আতাউল গণি ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন। বাস্তব কারণে এ সরকার ভারতের মাটিতে থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করতেন বলে একে প্রবাসী সরকারও বলা হয়।

মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তাজউদ্দিন আহমদের সুযোগ্য নেতৃত্বে মুজিবনগর সরকার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। একটি সার্বভৌম সরকারের সকল ক্ষমতা প্রয়োগে মুজিবনগর সরকার সফল হয়েছিল। দেশকে পাকিস্তানী কবল মুক্ত করার মূল লক্ষ্য সামনে রেখে মুজিব নগর সরকার গঠিত হয়। মুক্তিবাহিনী, নিয়মিত বাহিনী, গেরিলা বাহিনীকে সংগঠিত করে নেতৃত্ব দেওয়া- তাদের বীরত্বের কথা জাতিকে জানানো, বহির্বিশ্বে জনমত সৃষ্টি এসব কাজই প্রবাসী সরকার সাফল্যের সাথে পালন করে। যুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

স্বাধীন বাংলাদেশের রূপরেখা

১৯৭১ সালের ১০ মে মুজিবনগর সরকার স্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যত রূপরেখা ঘোষণা করে। এ ঘোষণায় বলা হয়- বাংলাদেশ সমাজতন্ত্রী আদর্শ গ্রহণ করবে। বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন হবে এবং ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা বাতিল করা হবে।

বিশ্বশান্তি পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণ

পাকিস্তানী বাহিনীর গণহত্যা এবং বাঙালিদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বাস্তব অবস্থা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার জন্য বুদাপেষ্টে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি পরিষদের সম্মেলনে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়। ১৩-১৬ মে' ১৯৭১ এ অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলায় সহায়তা করে।

বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা

যুদ্ধকালীন অবস্থাতেই মুজিবনগর সরকার প্রতিটি জেলার জন্য জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে পূর্ণাঙ্গ প্রশাসনিক টিম গঠন করে। এর লক্ষ্য ছিল প্রশাসনিক শূন্যতা পূরণ করা। একটি সার্বভৌম সরকারের সকল ক্ষমতা প্রয়োগে মুজিবনগর সরকার সফল হয়েছিল।

পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন

দেশের অভ্যন্তরে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরনার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ মুজিব নগর সরকারের অন্যতম সাফল্য। গৃহনির্মাণসামগ্রী, কৃষিউপকরণ, স্বাস্থ্যসেবা, যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল করা- এসবই সরকারের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সারকথা

১৯৭০ সালের সাধারন নির্বাচনে জয়লাভ করলেও পাকিস্তানী শাসকচক্র বাঙ্গালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার চক্রান্ত শুরু করে। নায্য অধিকার আদায়ের দাবিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙ্গালিরা মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের কারণে ভীত হয়ে পাকিস্তানী শাসকচক্র সংকট নিরসনের জন্য আলোচনা শুরু করলেও গোপনে সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। অবশেষে ২৫ মার্চের মধ্য রাত্রিতে (ঘড়ির কাটা অনুযায়ী ২৬ মার্চ) বঙ্গবন্ধু সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ১০ এপ্রিল ১৯৭১ মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভা আনুষ্ঠানিক ভাবে শপথ গ্রহণ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্বক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক (√) দিন

১। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন কবে স্থগিত ঘোষণা করা হয় ?
(ক) ১ মার্চ ১৯৭১ (খ) ৩ মার্চ ১৯৭১
(গ) ৭ মার্চ ১৯৭১ (ঘ) ২৫ মার্চ ১৯৭১

২। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার কবে গঠিত হয় ?
ক) ১০ এপ্রিল ১৯৭১ খ) ১১ এপ্রিল ১৯৭১
গ) ১২ এপ্রিল ১৯৭১ ঘ) ১৩ এপ্রিল ১৯৭১

৩। মুজিব নগর সরকার কবে গঠিত হয় ?
ক) ২৫ মার্চ ১৯৭১ খ) ১০ এপ্রিল ১৯৭১
গ) ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ ঘ) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

৪। স্বাধীনতা সনদে বাংলাদেশকে কোন ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরিণত করার ঘোষণা করা হয় ?
ক) গনপ্রজাতন্ত্রী খ) সমাজতন্ত্রী
গ) পুঁজিবাদী ঘ) সামরিক-আমলাতান্ত্রিক

উত্তর মালা: ১। ক, ২। ক, ৩। গ, ৪। ক

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন।
২। মুজিবনগর সরকারের গঠন ও ভূমিকা আলোচনা করুন।